বাংলাদেশের
বিভিন্ন স্থাপনা

জাতীয় সংসদ ভবন

জাতীয় সংসদ ভবন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রধান ভবন। এটি ঢাকার শেরেবাংলা নগর এলাকায় অবস্থিত। প্রখ্যাত মার্কিন স্থপতি লুই আই কান এটির মূল স্থপতি।

জাতীয় সংসদ ভবন

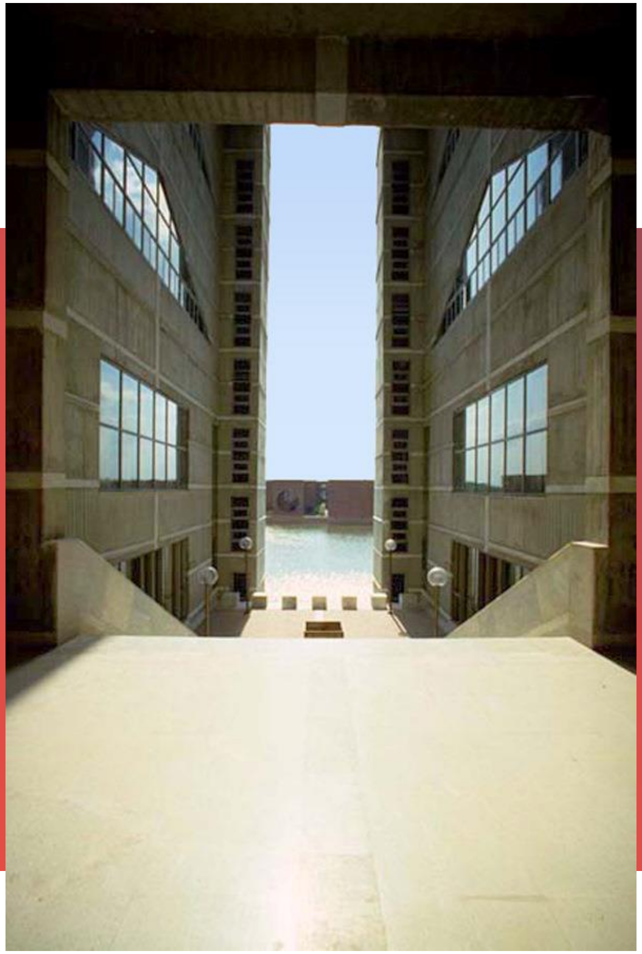

মূল ভবনটি নয়টি পৃথক ব্লক দিয়ে তৈরী: মাঝের অষ্টভূজ ব্লকটির উচ্চতা ১৫৫ ফুট এবং বাকি আটটি ব্লকের উচ্চতা ১১০ ফুট। প্রতিটি ব্লকের জায়গাকে বিভিন্ন কাজের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে, করিডোর, লিফট, সিড়ি ও বৃত্তাকার পথ দিয়ে আনুভূমিক ও উলম্বিকভাবে ব্লকগুলোর মাঝে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। পুরো ভবনটির নকশা এমনভাবে প্রনয়ন করা হয়েছে যাতে সব ব্লকগুলোর সমন্বয়ে একটি ব্লকের অভিন্ন স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

জাতীয় সংসদ ভবন

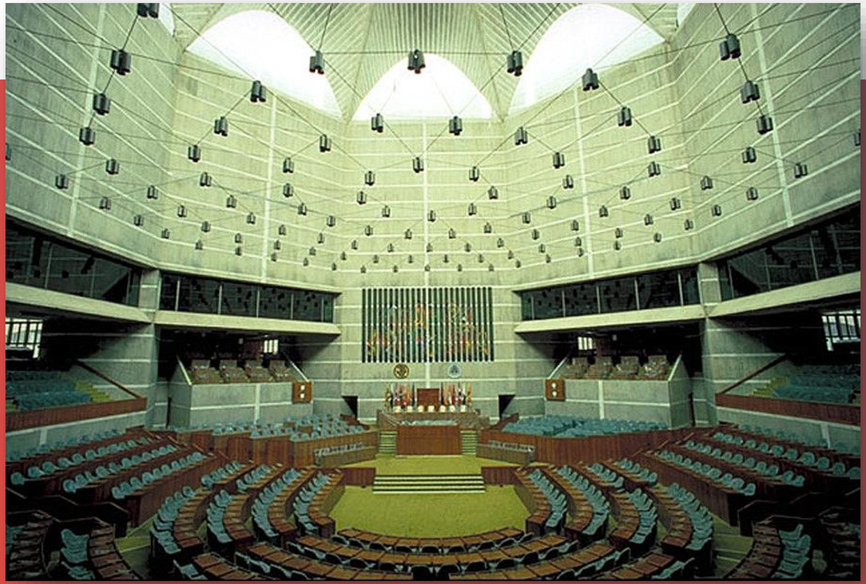

দ্বিতীয় তলার একটি লাগোয়া ব্লকে প্রধান কমিটির রুমগুলো রয়েছে। সকল ধরনের সংসদীয় কার্যক্রম, মন্ত্রী, চেয়ারপারসন এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির অফিস রয়েছে এই ভবনে। একই ভবনে সংসদীয় সচিবের জন্যও কিছু অফিস বরাদ্দ রয়েছে।

জাতীয় সংসদ ভবন

নির্মাণকার্য সূচনা: ১৯৬১

নকশা ও নির্মাণ ব্যয়: ১২৯ কোটি টাকা

উদ্বোধন: ২৮শে জানুয়ারি, ১৯৮২

স্থপতি: লুইস কান

মোট এলাকা: ২00 একর (৮,00,000 বর্গমিটার)

অবস্থান: শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা

মোট সংসদের সংখ্যা: ৭

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত মুক্তিযোদ্ধা ও নিহত বেসামরিক বাঙালি ও অবাঙ্গালিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি স্মারক স্থাপনা। এটি সাভারে অবস্থিত। এর নকশা প্রণয়ন করেছেন স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন।

এখানে মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের দশটি গণকবর রয়েছে। বিদেশি রাষ্ট্রনায়কগণ সরকারিভাবে বাংলাদেশ সফরে আগমন করলে এই স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন রাষ্ট্রাচারের অন্তর্ভুক্ত।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

নির্মাণ শুরু হয়েছে	১৯৭৮
সম্পূর্ণ	১৯৮২

সাতটি ত্রিভুজাকৃতি মিনারের শিখর দেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাতটি পর্যায়ের প্রতিটি এক ভাবব্যঞ্জনাতে প্রবাহিত হচ্ছে। এই সাতটি পর্যায়ের প্রতিটি সূচিত হয় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। পরবর্তীতে চুয়ান্ন, ছাপান্ন, বাষট্টি, ছেষট্টি ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

মিনারটি ৪৫ মিটার (১৫০.০০ ফুট) উঁচু এবং জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিন্দুতে অবস্থিত। মিনার ঘিরে আছে কৃত্রিম হ্রদ এবং বাগান। স্মৃতিসৌধ চত্বরে আছে মাতৃভূমির জন্য আত্মোৎসর্গকারী অজ্ঞাতনামা শহীদের দশটি গণসমাধি। স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে আরও রয়েছে উন্মুক্ত মঞ্চ, অভ্যর্থনা কক্ষ, মসজিদ, হেলিপ্যাড, ক্যাফেটেরিয়া।

স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণের সর্বমোট আয়তন ৮৪ একর। স্মৃতিস্তম্ভ পরিবেষ্টন করে রয়েছে ২৪ একর এলাকাব্যাপী বৃক্ষরাজিশোভিত একটি সবুজ বলয়। স্মৃতিসৌধটির উচ্চতা ১৫০ ফুট। সৌধটি সাত জোড়া ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল নিয়ে গঠিত।

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ। এটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বহিপ্রাঙ্গনে অবস্থিত। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে এখানে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়ে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। এটি ঢাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত অন্যতম পর্যটন বিন্দু।

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ ব্যক্তিত্ব আবুল বরকতের মাতা হাসিনা বেগম কর্তৃক নতুন শহীদ মিনারের উদ্বোধন করা হয়।

স্থপতি	হামিদুর রহমান
উচ্চতা	১৪ মিটার (৪৬ ফুট)

শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে নির্মিত একটি স্মৃতি স্মারক। এই স্মৃতিসৌধটি ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার রায়েরবাজার এলাকায় অবস্থিত।

স্মৃতিসৌধটির নকশা করেছেন স্থপতি ফরিদ ইউ আহমেদ ও জামি আল শাফি। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সন্তানদের সংগঠন প্রজন্ম ৭১-এর সহায়তায় রায়েরবাজারে স্মরণ তৈরির প্রাথমিক প্রস্তাবনা আনা হয়েছিল, যারা ১৯৯১ সালে এর একটি অস্থায়ী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে

শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

স্থপতি ফরিদ উদ্দিন আহমেদ
মোঃ জামে-আল-শফি

স্মৃতিসৌধের যেখানে মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় সেখানে রায়েরবাজারের মূল ইটভাটা ১৭.৬৮মি পুরু, ০.৯১মি উঁচু এবং ১১৫.৮২মি দীর্ঘ বাঁকা ইটের প্রাচীর। প্রাচীর নিজেই দুঃখ ও দুঃখের গভীরতা প্রদর্শক, যার দুই প্রান্তই নষ্ট হয়ে গেছে। দেয়ালের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৬.১০মি গুনন ৬.১০মি বর্গাকার জানালা দিয়ে দর্শকরা আকাশ দেখতে পারে, এছাড়াও প্রকাণ্ড প্রাচীরের স্কেল নিচের দিকে গেছে। বাঁকা প্রাচীরের সামনে পানির মধ্যে অবস্থিত একটি কালো গ্রানাইট স্তম্ভ যা বিষাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

অপরাজেয় বাংলা

অপরাজেয় বাংলা ভাষ্কর্যটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মরণে নিবেদিত একটি ভাষ্কর্য যা তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে চিত্রায়িত করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে অবস্থিত একটি ভাষ্কর্য। এটি নির্মাণ করেন মুক্তিযোদ্ধা ভাষ্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ। অপরাজেয় বাংলা নামকরনটি করেছিলেন মুক্তিযাদ্ধা ও সাংবাদিক সালেহ চৌধুরী

বাংলা একাডেমি

বাংলা একাডেমি ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর (১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা ও প্রচারের লক্ষ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) এই একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন-পরবর্তী কালের প্রেক্ষাপটে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন "বর্ধমান হাউজ"-এ এই একাডেমির সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। একাডেমির "বর্ধমান হাউজে" একটি "ভাষা আন্দোলন জাদুঘর" আছে।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম ১৯৫৪ সালের নির্মিত। ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশের জাতীয় ও প্রধান স্টেডিয়াম। ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মতিঝিল এলাকায় এটির অবস্থান। স্টেডিয়ামটি আগে এবং এখনও ১ নম্বর জাতীয় স্টেডিয়াম নামে পরিচিত । নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে এটির নামে বঙ্গবন্ধু যোগ করা হয়।

আগে স্টেডিয়ামে সব ধরনের খেলাই অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু বর্তমানে স্টেডিয়ামটিকে কেবল ফুটবল মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ধারনক্ষমতা প্রায় ৩৬,০০০। ২০০৫ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত স্টেডিয়ামটি বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নিজস্ব মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হত।

ষাট গম্বুজ মসজিদ

বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। মসজিদটির গায়ে কোনো শিলালিপি নেই। তাই এটি কে নির্মাণ করেছিলেন বা কোন সময়ে নির্মাণ করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী দেখলে এটি যে খান জাহান আলী নির্মাণ করেছিলেন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না।

ধারণা করা হয় তিনি ১৫শ শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন। এ মসজিদটি বহু বছর ধরে ও বহু অর্থ খরচ করে নির্মাণ করা হয়েছিল। পাথরগুলো আনা হয়েছিল রাজমহল থেকে। এটি বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের একটির মধ্যে অবস্থিত; বাগেরহাট শহরটিকেই বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো এই সম্মান প্রদান করে।

লালবাগের কেল্লা

লালবাগের কেল্লা (কিলা আওরঙ্গবাদ) ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত একটি অসমাপ্ত মুঘল দুর্গ। এটির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ১৬৭৮ সালে, মুঘল সুবাদার মুহাম্মদ আজম শাহ কর্তৃক, যিনি ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র এবং পরবর্তীতে নিজেও সম্রাট পদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তার উত্তরসুরী, মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খাঁ ১৬৮০ সালে নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু করেন, কিন্তু শেষ করেননি।

লালবাগ কেল্লার তিনটি স্থাপনার মধ্যে অন্যতম এটি। এখানে পরী বিবি সমাহিত আছেন। শায়েস্তা খান তার কন্যার স্মরণে এই মনমুগ্ধকর মাজারটি নির্মাণ করেন।

মহাস্থানগড়

বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্তি। প্রসিদ্ধ এই নগরী ইতিহাসে পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর নামেও পরিচিত ছিল। এক সময় মহাস্থানগড় বাংলার রাজধানী ছিল। যিশু খ্রিষ্টের জন্মেরও আগে অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এখানে সভ্য জনপদ গড়ে উঠেছিল প্রত্নতাত্ত্বিক ভাবেই তার প্রমাণ মিলেছে। ২০১৬ সালে এটি সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা হয়।

দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ি বা উত্তরা গণভবন

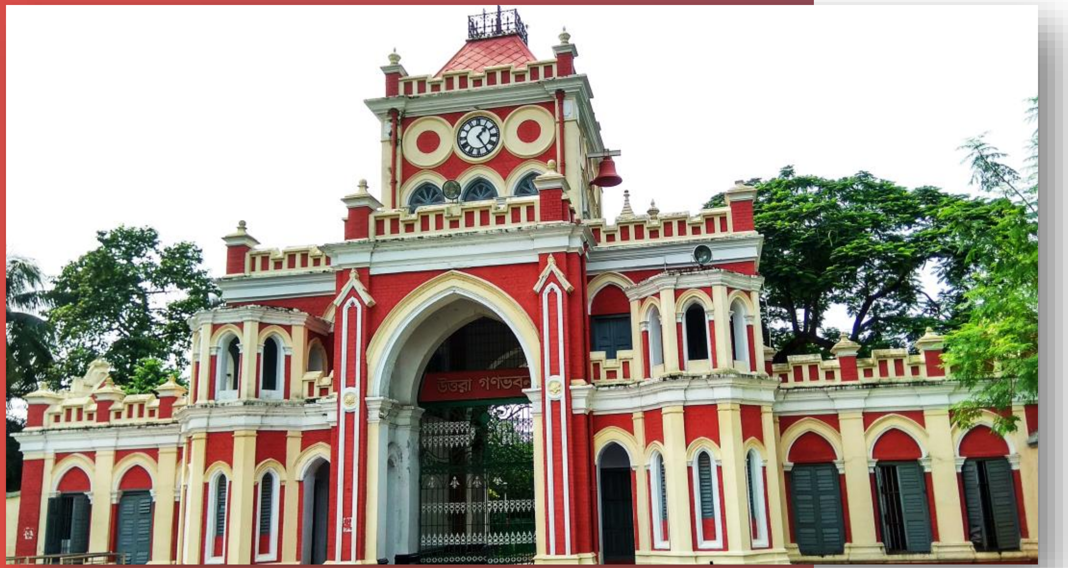

আঠারো শতকে নির্মিত দিঘাপতিয়া মহারাজাদের বাসস্থান। এটি বাংলাদেশের নাটোর শহরে অবস্থিত। নাটোর শহর থেকে প্রায় ২.৪ কিমি দূরে প্রাসাদটি অবস্থিত। বর্তমানে এটি উত্তরা গণভবন বা উত্তরাঞ্চলের গভর্মেন্ট হাউস নামে পরিচিত। ১৯৭২ সনের ৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিঘাপতিয়া রাজবাড়ীকে উত্তরা গণভবন নামকরণ করেন।

সাত গম্বুজ মসজিদ

ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত মুঘল আমলে নির্মিত একটি মসজিদ। এই মসজিদটি চারটি মিনারসহ সাতটি গম্বুজের কারণে মসজিদের নাম হয়েছে 'সাতগম্বুজ মসজিদ'।

এটি মুঘল সাম্রাজ্য মুঘল আমলের অন্যতম নিদর্শন। ১৬৮০ সালে মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খাঁর আমলে তার পুত্র উমিদ খাঁ মসজিদটি নির্মাণ করান। মসজিদটি লালবাগ দুর্গ মসজিদ এবং খাজা আম্বর মসজিদ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার বা সোমপুর বিহার বা সোমপুর মহাবিহার বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। পালবংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপাল দেব (৭৮১-৮২১) অষ্টম শতকের শেষের দিকে বা নবম শতকে এই বিহার তৈরি করছিলেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম এই বিশাল স্থাপনা আবিষ্কার করেন।

পাহাড়পুরকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৌদ্ধবিহার বলা যেতে পারে। আয়তনে এর সাথে ভারতের নালন্দা মহাবিহারের তুলনা হতে পারে। এটি ৩০০ বছর ধরে বৌদ্ধদের অতি বিখ্যাত ধর্ম শিক্ষাদান কেন্দ্র ছিল। শুধু উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকেই নয়, বরং চীন, তিব্বত, মায়ানমার (তদানীন্তন ব্রহ্মদেশ), মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা এখানে ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে আসতেন। খ্রিস্টীয় দশম শতকে বিহারের আচার্য ছিলে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের স্বীকৃতি প্রদান করে।

আহসান মঞ্জিল

পুরান ঢাকার ইসলামপুরের কুমারটুলী এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি পূর্বে ছিল ঢাকার নবাবদের আবাসিক প্রাসাদ ও জমিদারীর সদর কাচারি। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব আবদুল গনি।তিনি তার পুত্র খাজা আহসানুল্লাহ-র নামানুসারে এর নামকরণ করেন।

১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে আহসান মঞ্জিলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে এখানে এক অনুষ্ঠিত বৈঠকে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। আহসান মঞ্জিল কয়েকবার সংষ্কার করা হয়েছে। সর্বশেষ সংষ্কার করা হয়েছে অতি সম্প্রতি। এখন এটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক পরিচালিত একটি জাদুঘর

পানাম নগর

পানাম নগর নারায়ণগঞ্জ জেলার, সোনারগাঁতে অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শহর। বড় নগর, খাস নগর, পানাম নগর - প্রাচীন সোনারগাঁর এই তিন নগরের মধ্যে পানাম ছিলো সবচেয়ে আকর্ষণীয় ।এখানে কয়েক শতাব্দী পুরনো অনেক ভবন রয়েছে, যা বাংলার বার ভূঁইয়াঁদের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত। সোনারগাঁর ২০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই নগরী গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশে পানাম নগরীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি নিয়ে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি হয় "সুবর্ণগ্রাম" নামে একটি ডকু-ড্রামা। নাটকটি রচনা করেন ইলোরা লিলিত এবং পরিচালনা করেন ফারুকে আজম। এছাড়াও ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে নাসির উদ্দীন ইউসুফ-এর পরিচালনায় "গেরিলা" নামের একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের চিত্রায়ণ হয় পানাম নগরীতে। চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশকে তুলে ধরতে পানাম নগরীকে বেছে নেয়া হয়েছে। ছবিটি মুক্তি পায় ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে।

হোসেনি দালান বা ইমামবাড়া

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের পুরান ঢাকার বকশীবাজারে অবস্থিত একটি শিয়া উপাসনালয় এবং কবরস্থান।

বিকল্প উচ্চারণ হুসনী দালান এবং ইমারতের গায়ে শিলালিপিতে ফারসী ভাষায় লিখিত কবিতা অনুসারে উচ্চারণ হোসায়নি দালান। এটি মোগল শাসনামলে ১৭শ শতকে নির্মিত হয়। ইমারতটি মুহাম্মাদের পৌত্র ঈমাম হোসেনের কারবালার প্রান্তরে মৃত্যুবরণ স্মরণে নির্মিত।

বড় কাটরা

ঢাকায় চকবাজারের দক্ষিণে অবস্থিত মুঘল আমলের একটি সরাইখানা। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজার নির্দেশে ১৬৪৪ থেকে ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে দিওয়ান (প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা) মীর আবুল কাসিম দ্বারা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে এই ইমারতটি নির্মাণ করা হয়। তিনি মীর-ই-ইমারত নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথমে এতে শাহ সুজার বসবাস করার কথা থাকলেও পরে এটি মুসাফিরখানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এক সময় স্থাপত্য সৌন্দর্যের কারণে বড় কাটরার সুনাম থাকলেও বর্তমানে এর ফটকটি ভগ্নাবশেষ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় বড় কাটরার তোরণে ফার্সি ভাষায় শাদুদ্দিন মুহম্মদ সিরাজী লিখিত একটি পাথরের ফলক লাগানো ছিল।

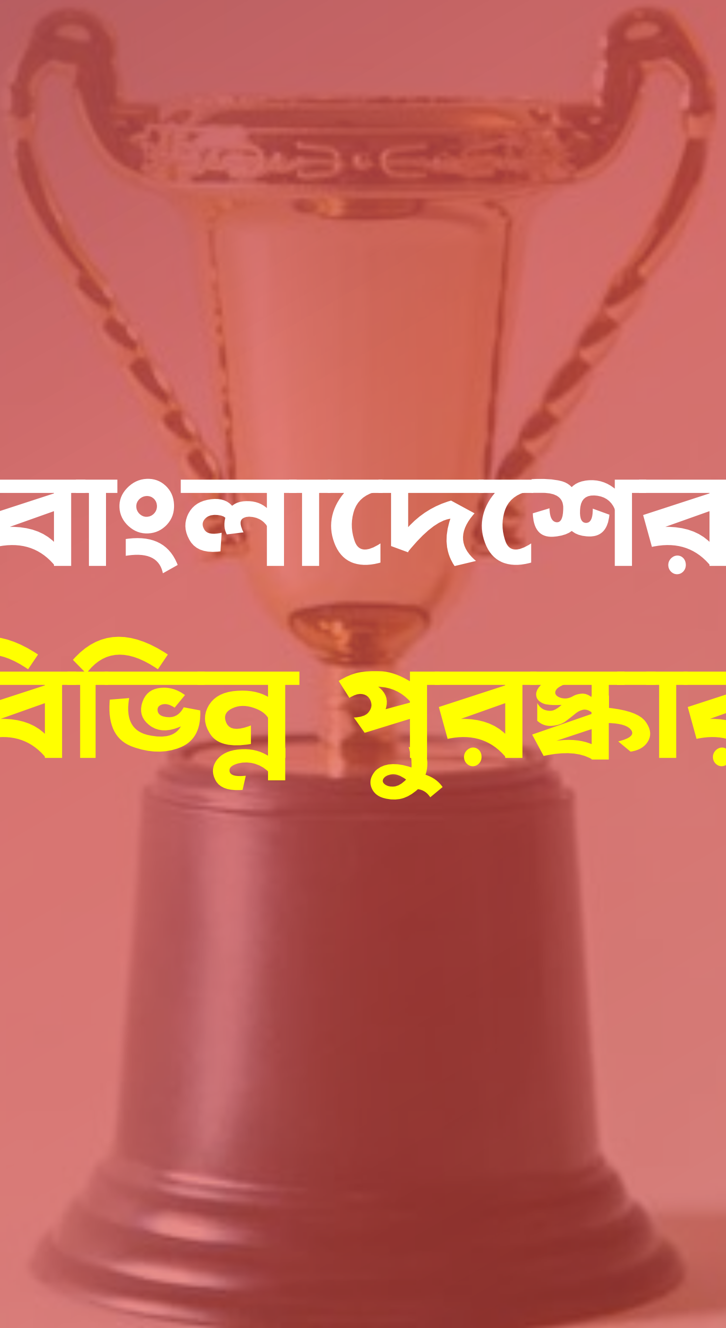

বাংলাদেশের
বিভিন্ন পুরষ্কার

বাংলাদেশের বিভিন্ন পুরষ্কার

বাংলাদেশে সরকারিভাবে প্রদত্ত জাতীয় পুরষ্কারগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

- স্বাধীনতা পুরষ্কার
- বীরত্বসূচক খেতাব

স্বাধীনতা পুরস্কার

স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার বা স্বাধীনতা পুরস্কার বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদক। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণে ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতি বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬শে মার্চ এই পদক প্রদান করা হয়ে আসছে।

এই পুরস্কার জাতীয় জীবনে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের নাগরিক এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ব্যক্তির পাশাপাশি জাতীয় জীবনের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অনন্য উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এই পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে।

স্বাধীনতা পুরস্কার

প্রত্যেক পদকপ্রাপ্তদের একটি ১৮ ক্যারেট স্বর্ণ নির্মিত ৫০ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট পদক, একটি সম্মাননাসূচক প্রত্যয়ন পত্র এবং সম্মাননা স্বরুপ নির্দিষ্ট অঙ্কের নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। প্রাথমিকভাবে প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ বিশ হাজার ছিল। তবে ২০১৩ সালে থেকে দুই লক্ষ টাকা করে প্রদান করা হয়

একুশে পদক

একুশে পদক বাংলাদেশের একটি জাতীয় এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ, দারিদ্র্য বিমোচনে অবদানকারী, সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পর্যায়ে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সাল থেকে একুশে পদক প্রদান করা হচ্ছে। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে ১৯৭৬ সালে এই পদকের প্রচলন করা হয়

বাংলা একাডেমী পুরস্কার

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ১৯৬০ সালে প্রবর্তিত একটি বাৎসরিক সাহিত্য পুরস্কার। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন পুরষ্কার

- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরষ্কার
- জাতীয় চলচ্চিত্র পুরষ্কার
- জাতীয় ক্রীড়া পুরষ্কার
- জনপ্রশাসন পদক

বাংলাদেশের
চলচ্চিত্র

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বলতে অবিভক্ত বঙ্গ (১৯৪৭ পর্যন্ত) থেকে শুরু করে পূর্ব পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সালের পর স্বাধীন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে বোঝায়।

বাংলাদেশ ভূখণ্ডের প্রথম বায়োস্কোপ প্রদর্শনী হয় কলকাতার ব্রেডফোর্ড বায়োস্কোপ কোম্পানির উদ্যোগে ১৮৯৮ সালের ৪ এপ্রিল তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার ভোলা মহকুমার (অধুনা ভোলা জেলা) এসডিওর (অধুনা ডিসি) বাংলোতে। ১৭ এপ্রিল বায়োস্কোপ প্রদর্শনী হয় ঢাকায় পাটুয়াটুলীর ক্রাউন থিয়েটারে। ক্রাউন থিয়েটারের অস্তিত্ব এখন আর নেই।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

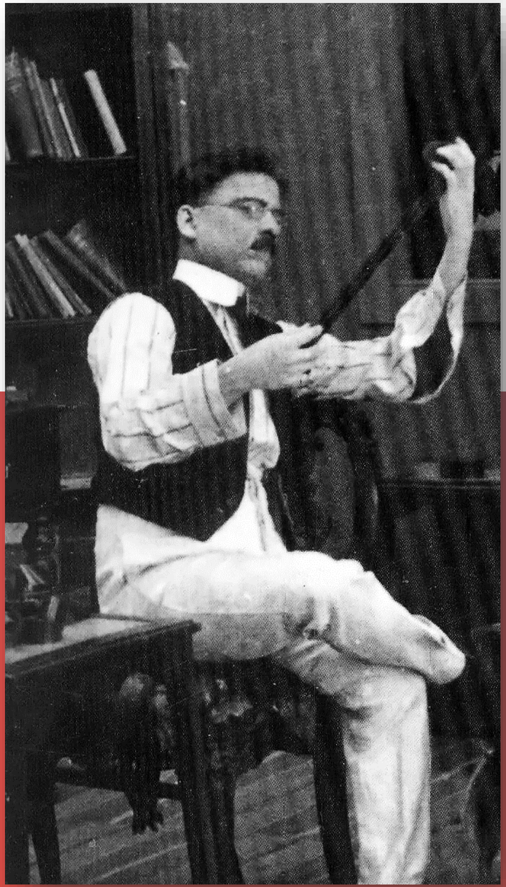

দাদাসাহেব ঢুণ্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকে

দাদাসাহেব ঢুণ্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকে হলেন উপমহাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের নির্মাতা। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তিনি দাদাসাহেব ফালকে নামেই বেশি পরিচিত। ১৯১৩ সালে তার নির্বাক চিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র মুক্তি পায়। ১৯১৬ সালে কলকাতায় ম্যাডান থিয়েটার্স কোম্পানির পক্ষ থেকে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত প্রথম বাংলা নির্বাক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিশ্বমঙ্গল মুক্তি পায়।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

সুকুমারী'র একটি দৃশ্যে নায়ক খাজা নসরুল্লাহ
ও নায়িকা বেশে সৈয়দ আব্দুস সোবহান

১৯২৭-২৮ সালে ঢাকায় প্রথম চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। নওয়াব পরিবারের কয়েকজন তরুণ সংস্কৃতিসেবী নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র সুকুমারী। এর পরিচালক ছিলেন জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন ক্রীড়াশিক্ষক অম্বুজপ্রসন্ন গুপ্ত।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরের বছর বছর সরকারি প্রচারচিত্র নির্মাণের জন্য জনসংযোগ বিভাগের অধীনে চলচ্চিত্র ইউনিট (১৯৫৩) গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে এখান থেকে নাজীর আহমদের পরিচালনায় নির্মিত হয় প্রামাণ্য চিত্র সালামত।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

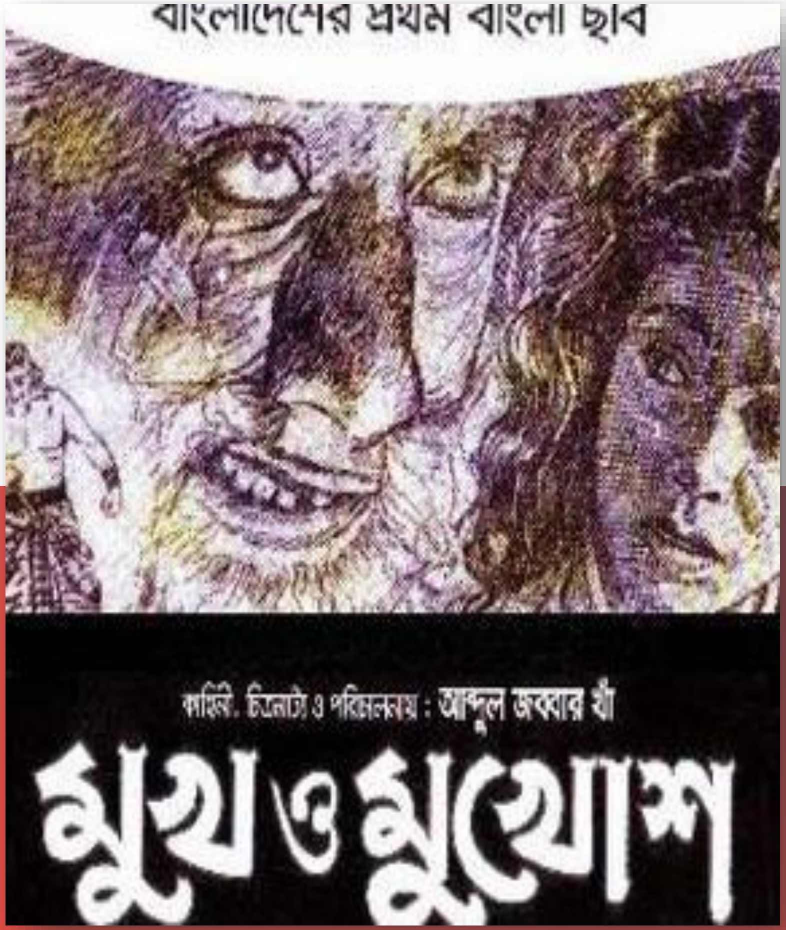

বাংলাদেশের পূর্বপাকিস্তান পর্বে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র শুরু হয়েছে ডাকাতের কাহিনী নিয়ে। আবদুল জব্বার খান রচিত নাটক ডাকাত-এর চিত্রায়নই মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬)।

আবদুল জব্বার খান (১৯১৬-১৯৯৩) জোয়ার এলো (১৯৬২), নাচঘর (উর্দু ১৯৬৩), বাঁশরী (১৯৬৮), কাচ কাটা হীরা (১৯৭০) ও খেলারাম (১৯৭৩) নির্মাণ করে চলচ্চিত্রশিল্পে তার অবদানের স্বাক্ষর রাখেন। উজ্জালা নামে একটি চলচ্চিত্রও তিনি প্রযোজনা করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকারের চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান হিসেবে আবদুল জব্বার খান কাজ করেন। চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য তিনি বাচসাস পুরস্কার

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

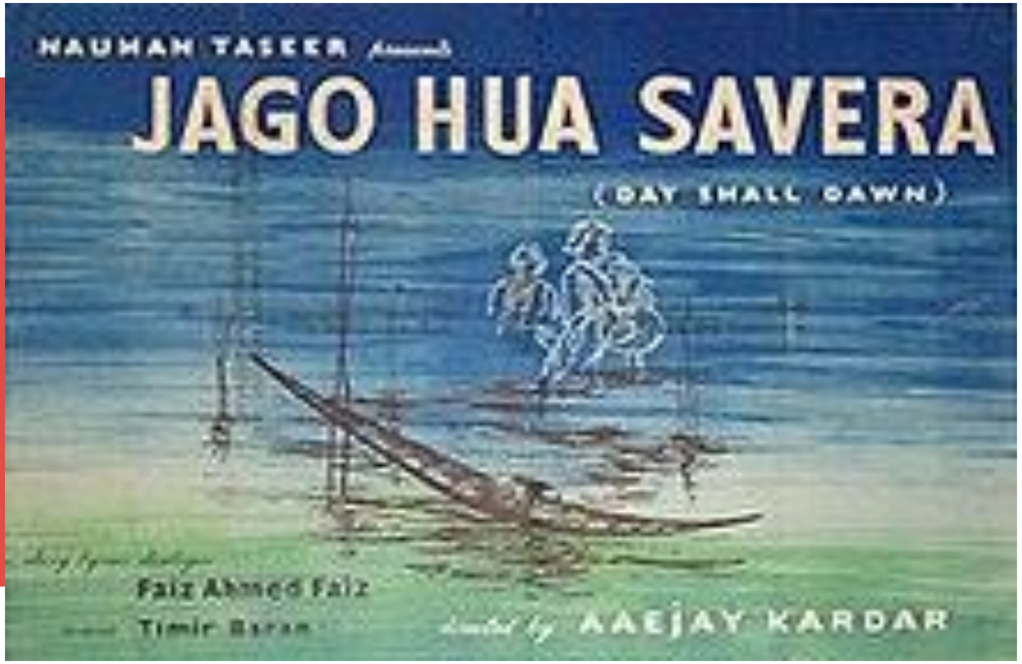

১৯৫৯ সালে আখতার জং কারদার পরিচালিত উর্দুচলচ্চিত্র জাগো হুয়া সাভেরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝির কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

জহির রায়হান

ষাটের দশকে সালাহ্উদ্দিনের যে নদী মরুপথে (১৯৬১), সূর্যস্নান (১৯৬২) ও ধারাপাত (১৯৬৩) প্রভৃতি সামাজিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। জহির রায়হান এই সময়ের উল্লেখযোগ্য পরিচালক।

তার যে নদী মরুপথে ও কখনো আসেনি(১৯৬১), সোনার কাজল (১৯৬২, কলিম শরাফী সহযোগে), কাচের দেয়াল (১৯৬৩), সঙ্গম (উর্দু ১৯৬৪), বাহানা (উর্দু, ১৯৬৫) এই সময়ের উজ্জ্বল সৃষ্টি। উর্দু চলচ্চিত্রের দিকে ঝুঁকেও তিনি আবার চোখ ফেরালেন লোকজ কাহিনীর দিকে। এরপর তিনি আনোয়ারা (১৯৬৭) নির্মাণ করেন। জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০), লেট দেয়ার বি লাইট (১৯৭০) (অসমাপ্ত), স্টপ জেনোসাইড (১৯৭১) ও এ স্টেট ইজ বর্ন (১৯৭১) চলচ্চিত্র গুলো ছিল বহিরবিশ্বের চলচ্চিতের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

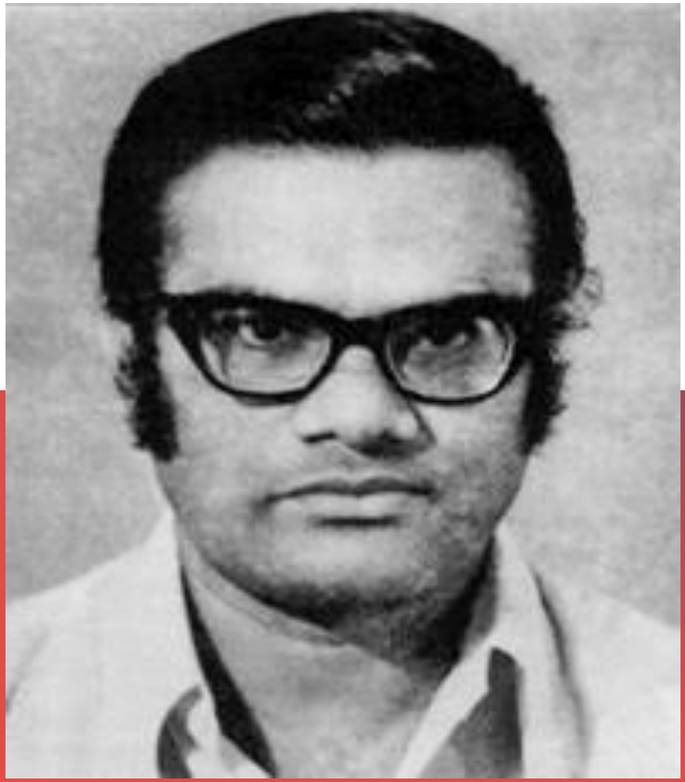

আলমগীর কবির

স্বাধীনতার পরে আবির্ভূত চলচ্চিত্র পরিচালকদের মধ্যে আলমগীর কবির (১৯৩৮-১৯৮৯) উল্লেখযোগ্য। তার নির্মিত চলচ্চিত্র হলো ধীরে বহে মেঘনা (১৯৭৩), সূর্য কন্যা (১৯৭৬), সীমানা পেরিয়ে (১৯৭৭), রূপালী সৈকতে (১৯৭৯), মোহনা (১৯৮২),পরিণীতা (১৯৮৬) ও মহানায়ক (১৯৮৪)।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

তারেক মাসুদ

২০০২ সালে তারেক মাসুদ পরিচালিত মাটির ময়না বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফিল্ম ফেস্টিভাল 'কান ফিল্ম ফেস্টিভাল' এ ডিরেক্টর'স ফোর্টনাইট ক্যাটাগরিতে মনোনীত ও প্রদর্শিত হয়, যা বাংলাদেশের জন্য একমাত্র অর্জন এই সিনেমাটি দিয়েই। তাছাড়াও ২০০৩ সালে ছবিটি সেরা বিদেশী ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে একাডেমি পুরস্কারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য পেশ করা হয়। চূড়ান্ত পুরস্কারের জন্য মনোনীত না হলেও এটি বেশ গুরুত্ববহ ছিল। কারণ এটিই প্রথম বাংলাদেশী ছবি যা অস্কারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

এরপর দুই বছর কোন বাংলাদেশী ছবি অস্কারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। ২০০৬ সাল থেকে প্রতি বছরই বাংলাদেশ থেকে একটি চলচ্চিত্র অস্কারের জন্য পেশ করা হচ্ছে। ২০০৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত পেশ করা সিনেমা তিনটি হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদের শ্যামল ছায়া, আবু সাইয়িদের নিরন্তর এবং গোলাম রাব্বানী বিপ্লবের স্বপ্নডানায়। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ থেকে পেশ করা হয়েছে মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর 'ডুব' চলচিত্রটি। সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমাদৃত ছবির মধ্যে রয়েছে নাসিরুদ্দিন ইউসুফের গেরিলা, মোস্তফা সরোয়ার ফারুকীর টেলিভিশন, অমিত আশরাফের উধাও এবং দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোচিত-সমালোচিত ছবি রুবাইয়াত হোসেনের মেহেরজান।

বাংলাদেশের
অর্জন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি:

কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরে বসবাসরত দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম প্রাথমিক উদ্যোক্তা হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানিয়েছিলেন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। সে সময় সেক্রেটারী জেনারেলের প্রধান তথ্য কর্মচারী হিসেবে কর্মরত হাসান ফেরদৌসের নজরে এ চিঠিটি আসে। তিনি ১৯৯৮ সালের ২০ শে জানুয়ারী রফিককে অনুরোধ করেন তিনি যেন জাতিসংঘের অন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রের কারো কাছ থেকে একই ধরনের প্রস্তাব আনার ব্যবস্থা করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি:

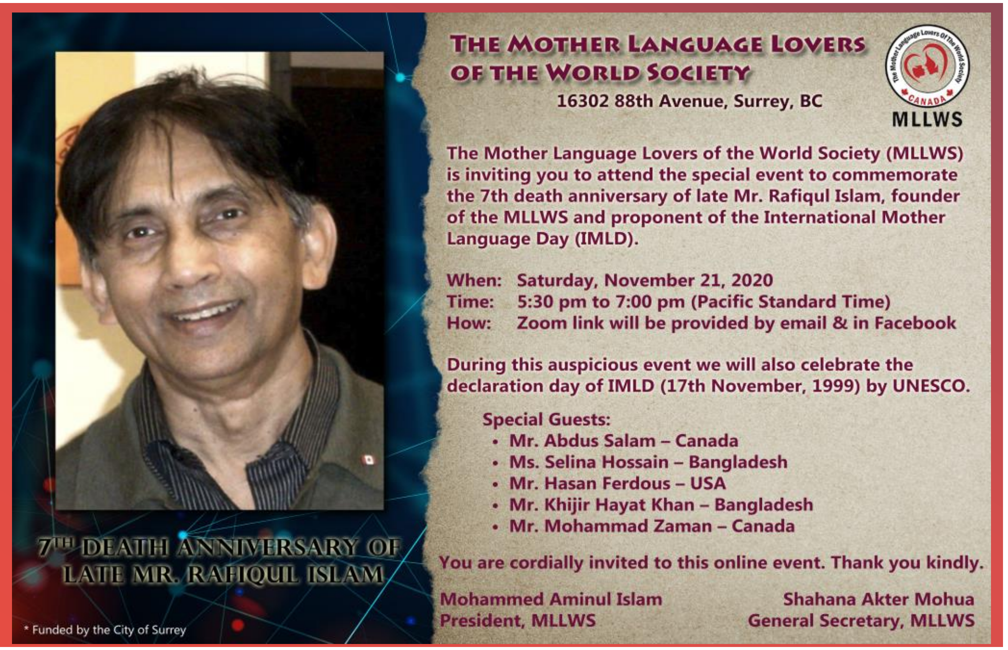

পরে রফিক, আব্দুস সালামকে সাথে নিয়ে “মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অফ দ্যা ওর্য়াল্ড” নামে একটি সংগঠন দাঁড় করান। এতে একজন ইংরেজিভাষী, একজন জার্মানভাষী, একজন ক্যান্টোনিজভাষী, একজন কাচ্চিভাষী সদস্য ছিলেন। তারা আবারো কফি আনানকে “এ গ্রুপ অব মাদার ল্যাংগুয়েজ অফ দ্যা ওর্য়াল্ড”-এর পক্ষ থেকে একটি চিঠি লেখেন, এবং চিঠির একটি কপি ইউএনওর কানাডীয় দূত ডেভিড ফাওলারের কাছেও প্রেরণ করা হয়। ১৯৯৯ সালে তারা জোশেফের সাথে ও পরে ইউনেস্কোর আনা মারিয়ার সাথে দেখা করেন, আনা মারিয়া পরামর্শ দেন তাদের প্রস্তাব ৫ টি সদস্য দেশ — কানাডা, ভারত, হাঙ্গেরি, ফিনল্যান্ড এবং বাংলাদেশ দ্বারা আনীত হতে হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি:

তারপর বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্মকর্তা প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন দানে ২৯টি দেশ অনুরোধ জানাতে কাজ করেন। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় ও এতে ১৮৮টি দেশ সমর্থন জানালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসঙ্ঘের সদস্যদেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে এখন থেকে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করবে জাতিসংঘ। - এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে উত্থাপন করে বাংলাদেশ। মে মাসে ১১৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতিসংঘের তথ্যবিষয়ক কমিটিতে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে পাস হয়।

সাতই মার্চের ভাষণ

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মার্চ ঢাকার রমনায় অবস্থিত রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক ভাষণ। তিনি উক্ত ভাষণ বিকেল ২টা ৪৫ মিনিটে শুরু করে বিকেল ৩টা ৩ মিনিটে শেষ করেন। উক্ত ভাষণ ১৮ মিনিট স্থায়ী হয়।

সাতই মার্চের ভাষণ

২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবরে ইউনেস্কো ৭ই মার্চের ভাষণকে "ডকুমেন্টারি হেরিটেজ" (বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই ভাষণটি সহ মোট ৭৭ টি গুরুত্বপুর্ণ নথিকে একইসাথে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইউনেস্কো পুরো বিশ্বের গুরুত্বপুর্ণ দলিলকে সংরক্ষিত করে থাকে। ‘মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে (এমওডব্লিউ) ’ ৭ মার্চের ভাষণসহ এখন পর্যন্ত ৪২৭ টি গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগৃহীত হয়েছে।

‘চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ’

২০১৫ সালে শেখ হাসিনা বিশ্বের সর্বোচ্চ পরিবেশ বিষয়ক পুরস্কার ‘চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ’ পুরস্কার লাভ করেন। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় দূরদর্শী পদক্ষেপে নেওয়ায় তাকে সেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই বছরই জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে আইসিটির ব্যবহারে প্রচারণার জন্য শেখ হাসিনাকে ‘আইসিটি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করা হয়। ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এমডিজি) অর্জনে বিশেষ করে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে অবদানের জন্য জাতিসংঘের অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান:

সুন্দরবন, খুলনা বিভাগ

মানদণ্ডঃ প্রাকৃতিক: (৯ম), (১০ম)

বছরঃ ১৯৯৭

বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান:

পাহাড়পুরে বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ,

নওগাঁ জেলা, রাজশাহী বিভাগ

মানদণ্ডঃ সাংস্কৃতিক: (১ম), (২য়), (৬ষ্ঠ)

বছর ১৯৮৫

বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান:

ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট

বাগেরহাট জেলা, খুলনা বিভাগ

মানদণ্ডঃ সাংস্কৃতিক: (৪র্থ) —

বছর ১৯৮৫

ইনটেনজিবল কালচারাল
হেরিটেজ

কালচারাল হেরিটেজ

ইউনেসকো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতিঃ

মঙ্গল শোভাযাত্রা ২৮ নভেম্বর ২০১৬

কালচারাল হেরিটেজ

২০০৮ সালে ‘বাউল সং’ ও
২০১৩ সালে ‘দ্য আর্ট অব জামদানি উইভিং
‘ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ’ হিসেবে
স্বীকৃতি পায়।

কালচারাল হেরিটেজ

ইউনেস্কোর বিশ্ব নির্বস্তুক সংস্কৃতি ঐতিহ্যের (ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি) তালিকায় **সিলেটের শীতলপাটির নাম আছে।**

জিআই:

জিআই একটি পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে যা ওই দেশ ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। যেখানে ট্রেডমার্ক কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কে ইস্যু করা হয় সেখানে জিআই একটি দেশকে ইস্যু করে। জিআই পণ্যের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো বিশ্ববাজারে এর ব্রান্ডিং যা সমমানের অন্য যেকোনো পণ্য থেকে একে এগিয়ে রাখে। বাংলাদেশের এমন আরো অনেক পণ্য আছে যা নিয়ে আমাদের নিজস্বতা দাবি করা লাগবে জোরালোভাবে।

জিআই:

বাংলাদেশের ভৌগোলিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সামগ্রী বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক সামগ্রী হিসেবে স্বীকৃতি পায় জামদানি ১৭ নভেম্বর ২০১৬। ৬ আগস্ট ২০১৭ DPDT জাতীয় মাছ ইলিশ কে বাংলাদেশী পণ্য হিসাবে বিশ্ব স্বীকৃতি অর্জনের কথা ঘোষণা করে। এর ফলে ইলিশ বাংলাদেশের দ্বিতীয় GI পণ্য হিসাবে নিবন্ধিত হলো। ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ক্ষীরষাপাতি আমকে বাংলাদেশের ৩য় GI পণ্য (foodstuff) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০২০ সালের ৩০ ডিসেম্বর মসলিনকে বাংলাদেশের জিআই পণ্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এল ডি সি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণঃ

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের আওতায় অগ্রাধিকারমূলক বিভিন্ন সুবিধা অর্জন করে, যা বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

এল ডি সি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণঃ

জাতিসংঘ ২০১৮-এর ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু জাতীয় আয় মার্কিন ডলার ১,২৩০ বা এর উর্ধ্বে (অথবা, শুধুমাত্র মাথাপিছু জাতীয় আয় মার্কিন ডলার ২,৪৬০ বা এর উর্ধ্বে); মানব সম্পদ সূচক (HAI) ৬৬ বা এর উর্ধ্বে; এবং অর্থনৈতিক সূচক ৩২ বা এর কম নির্ধারণ করেছে। উত্তরণের নিমিত্ত তিনটি সূচকের যে কোন দু'টি অর্জন করলেই চলে। কিন্তু, বাংলাদেশ তিনটি সূচকেই নির্ধারিত মানদন্ড অতিক্রম করেছে --- মাথাপিছু জাতীয় ; মানব সম্পদ সূচক (HAI) অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক ।

এল ডি সি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণঃ

জাতিসংঘের নিয়মানুসারে পরবর্তী দুটি ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় (২০২১, ২০২৪) বাংলাদেশের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলে বাংলাদেশ ২০২৪ সালে স্বল্পোন্নত দেশের গন্ডি থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ধন্যবাদ